ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়

নয়া দিগন্ত
বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, ৭ ফাল্গুন ১৪১৫

১৯৫২ সালে বিয়ের আসরে (ডানে)

একুশে ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় এটিএন বাংলায় প্রচারিত হবে আব্দুল লতিফ স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়’। বরেণ্য এই ভাষাসৈনিককে নিয়ে দীর্ঘ এক মাস এই অনুষ্ঠানের তথ্য ও গান সংগ্রহ করেছেন সাংবাদিক ও সুরকার তানভীর তারেক। এ ছাড়া আব্দুল লতিফের জীবদ্দশায় তার সাথে কথোপকথন হয়েছে একাধিকবার। ভাষার এই মাসে বরেণ্য এই ভাষাসৈনিককে নিয়েই আনন্দলোকের প্রধান ফিচার লিখেছেন তিনি

সর্বশেষ লতিফ ভাইয়ের বাসায় আমি যখন ইন্টারভিউ নিতে যাই, তখন পড়ন্ত বিকেল। লতিফ ভাইয়ের শ্যামলীর বাসায় বসে আছি। লতিফ ভাই বাসায় নেই। কোথায় যেন গিয়েছেন ভাবীও বলতে পারছেন না। অবশেষে নাজমা লতিফ (আব্দুল লতিফের স্ত্রী) বাসার কেয়ারটেকারকে পাঠালেন আশপাশের কোথায় গেছেন তাকে খুঁজে আনতে। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর লতিফ ভাইকে পাওয়া গেল পাশের চায়ের দোকানিকে গান শেখাচ্ছেন এবং ঘরের হারমোনিয়ামটাও কোনো এক ফাঁকে নিয়ে গেছেন চায়ের দোকানে। এমনই ছিলেন শিল্পী ভাষাসৈনিক আব্দুল লতিফের জীবন।

আব্দুল লতিফের পৃথিবী-প্রস্থান হয়েছে চার বছর। বরাবরের মতো ফেব্রুয়ারি এলেই আবারো তাকে স্মরণ করি আমরা। ঠিক লতিফ ভাই বেঁচে থাকতেও একই কথা বলতেন, ‘তানভীর এই ফেব্রুয়ারি এলেই তোমরা সবাই আমার কথা শুনতে আসো কেন? আমি কি আমার সব গান শুধু এই

একটি মাসের জন্যই লিখেছিলাম।' অনেক আক্ষেপ আর অভিমান যেন ঝরে পড়েছিল সেই সময়। দীর্ঘ চার বছর পর আজ যখন এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান-প্রধান নওয়াজিশ আলী খান দায়িত্ব দিলেন তার স্মরণে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করার, তখন আবারো তার স্মৃতি হাতড়ানোর সুযোগ পেলাম এটিএন বাংলার সিনিয়র প্রডিউসার শাহীনা আকতারের সহায়তায়। সে কথার আগে আব্দুল লতিফের সাথে আগের কিছু কথা শোনাতে চাই

আব্দুল লতিফের কথোপকথন

আচ্ছা লতিফ ভাই, আপনার এই গানের প্রতি আসক্তিটা কবে থেকে শুরু হয়েছিল?
আমি তো কখনোই ভাবিনি যে গানের শিল্পী হিসেবে আমার আজকের এই পরিচিতি আসবে। আমি এখনো খুব ভালো লিখতে পারি না। নিজের খেয়ালখুশিমতো কিছু কথা লিখতাম। এটা লিখতাম নিজের মনের খোরাক জোগানোর জন্য। এ ছাড়া আমার গান নিয়ে বিশেষ কোনো প্রত্যাশা ছিল না।

তো কখন থেকে আপনি শিল্পী হতে শুরু করলেন?
আমি তো শিল্পী হতে চাইনি। বন্ধুরা জোর করে শিল্পী বানিয়ে দিয়েছে। আমি নিজের জন্য গান করতাম। একবার এক স্কুলের অনুষ্ঠানে মূল শিল্পী আসেনি। জোর করে আমাকে তুলে দেয়া হলো। আমি তো লজ্জায়, ভয়ে মরে যাই। ধরণীকে বলি তুই দু'ভাগ হয়ে যা... আমি লুকায়ে পড়ি। মঞ্চে উঠে সামনে এত্ত মানুষ দেখে আমি তখন দৌড়ে পালালাম। কিন্তু অত মানুষের ভিড়ে পালিয়ে আমি যাবোই বা কোথায়? সিনিয়র ভাইয়েরা কান ধরে নিয়ে এলেন। আমি ভয়-সঙ্কোচ নিয়ে গাইলাম 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি...' গান চোখ বুজে গাইতে থাকলাম। গান শেষে দেখি সবাই তালি দিচ্ছে। তখন কিছুটা মনে হলো যে আমি গাইতে পারি।

লতিফ ভাই আপনার কাছে তালিম নিয়ে অনেকেই শিল্পী হয়েছেন। অথচ অনেকেই এটা অস্বীকার করেন... আক্ষেপ হয় না?
না, এতে আক্ষেপের কী আছে। আর কেউ স্বীকার করবে আর আমি ধন্য হয়ে যাবো এই আশাতে তো আমি গান শিখাইনি। আমি যতটুকু করি এই গান নিয়ে, তার পুরোটাই নিজের মনের খোরাক জোগানোর জন্য। এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি এক দোকানিকে শেখাচ্ছিলাম। এ মানুষটা দুপুরবেলায় তার ব্যবসা ফেলে আমার কাছ থেকে একটু গান গাইবার তালিম নিতে চায়... এটা তো অনেক বড় ব্যাপার। আমি শেখাতে লাগলাম।

আচ্ছা আপনি খুব অল্প বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন... হঠাৎ গান ছেড়ে এ ধরনের পেশায়?
আসলে তখন তো একেবারেই ছোট... আর তখন তো জীবনের লক্ষ্যটাও ঠিক হয়নি। আমি তখন কেবল ক্লাস এইটে পড়ি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বরিশালে আমার গ্রামের স্কুলে সেনা নিয়োগ। এমনি কোনো কারণ ছাড়াই পরীক্ষায় দাঁড়ালাম। সেনাকর্মকর্তার আমাকে পছন্দ হয়ে গেল। এ দিকে আমার বাসায় তো মহা চিন্তায় পড়ে যায়, কারণ কেউই এ ঘটনার কথা জানে না। আর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ট্রেনিং। সবাই একরকম টেনশনেই পড়ে গিয়েছিল। নতুন এই ব্যাটালিয়নের তৎকালীন নাম ছিল 'সিক্সটিন বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন'। সেখান থেকে ট্রেনিংয়ের জন্য দার্জিলিং যেতে হবে। গেলাম। ট্রেনিং নিয়ে হলাম নওজোয়ান। কিন্তু বাংলার সৈন্যদের বিদেশে যুদ্ধের জন্য পাঠানো যাবে না এমন নির্দেশ দিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাই ফিরে এলাম কলকাতায়।

কিন্তু এরপর গানে অর্থাৎ আজকের আব্দুল লতিফের পথচলাটা শুরু হলো কিভাবে?
কলকাতায় আমি যখন সেনাবাহিনীতে কোনো কাজের সুযোগ পেলাম না... তখন ওই শহরে আমার বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে। একপর্যায়ে সেলাইয়েরও কাজ করতাম। কারণ তখন দেশবিভাগ না হলেও কলকাতা আমার কাছে পুরোটাই একবারে নতুন দেশ। তবে ওই সময় কলকাতা ভুজঙ্গ মোহন নামের এক উকিলের বাসায় লজিং থাকতাম। উকিল সাহেব গানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাই গানের সুযোগটা মিলত। কিন্তু আমার তো তখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান শিখতে হবে। তাই মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের আশ্রমে চলে যেতাম। কিন্তু আমি তো সেনাবাহিনীতে এসেছিলাম ঘর ছেড়ে এবং বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে। তাই শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি। আমার ওই সময় আর বাড়িতে ফেরার কোনো তাগিদ অনুভব করতাম না। কিন্তু কিভাবে যেন খোঁজখবর পেয়ে ভুজঙ্গ বাবুর কাছে চলে এলেন বাড়ির লোক। শেষে আমাকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হলো। কিন্তু ধড়পাকড় করে আমাকে বাড়িতে আনা হলেও আমার মন তো পড়ে থাকে ভুজঙ্গ বাবুর বারান্দায়...দক্ষিণেশ্বরের আশ্রমে। তাই আবারো পালালাম। বড় ভাইয়ে পকেট থেকে টাকা চুরি করে আবারো এলাম ভুজঙ্গ বাবুর বাসায়। তখন থেকেই আমার প্রথাগতভাবে গান শেখার শুরু সুরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি... এই গানটির প্রথম সুর করলেন আপনি...সেই ইতিহাসটা একটু শুনতে চাই...
এই প্রশ্নের উত্তর অনেক দিয়েছি। আসলে গানটা যে বেঁচে আছে... এটাই বড় কথা। ১৯৫৩ সালের কথা। তখন ভাষার আন্দোলনে উত্তাল ঢাকা। আমাকে আতিকুল ইসলাম গানটি দেন। এটি মূলত ছিল তখনকার প্যামপ্লেটে লেখা এক কবিতা। আমার অভ্যাস ছিল ভালো কোনো লেখা পেলেই তাতে সুর দেয়া। অথচ তখনো জানি না গানটি কে লিখেছেন। পরে জানলাম এটি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা। এরপর সে সময় ঢাকা কলেজের এক অনুষ্ঠানে গানটি গাইলাম। সাথে সাথে গানটি নিয়ে আলোড়ন উঠল। সাথে সাথে কয়েকজনকে ঢাকা কলেজ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়া হলো। পুরো এক সপ্তাহ আমার সেই শো নিয়েই ঢাকায় তোলপাড় শুরু হয়। যা-ই হোক গানটি যে এত ব্যাপকতা পাবে সে দিনই আমি বুঝে গিয়েছিলাম। এরপর এক আসরে আমার খুব কাছের এবং প্রিয় মানুষ আলতাফ মাহমুদ বললেন গানটিতে সে একটুখানি সুর দেবেন। আমি অনুমতি দিলাম। এরপর শুনে আমারও ভালো লাগল সেই সুর। আমি বললাম এই সুরটিই যাবে। আমার সুর বাতিল।

কিন্তু এই মহানুভবতা তো এখনকার শিল্পীদের ভেতর নেই। এখন তো উল্টো অন্যের সুর নিজের নামে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা চার দিকে।
এখনকার শিল্পীরা তো কত কিছুই করছে। কিন্তু আমার এটা মহানুভবতা বলব না। বরং ওই সময় এটা আমার দায়িত্ব ছিল। আমি কখনো আমার কাজ নিয়ে আত্মগরিমায় থাকিনি।

তবে কি এর পরেই লিখলেন 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়...'
এটা বলতে পারো। তবে গানটি মাত্র আধা ঘণ্টায় লেখা। গানটি লিখে আমি অনেক মানুষকে দেখিয়েছি। এরপর তোমাদের ভাবী বললেন, কবি ফররুখ আহমদকে দেখাতে। তখন কবি আমাদের বাসার পাশেই থাকতেন। আমি নিয়ে গেলাম। তিনি দেখে খুব উৎসাহ দিলেন। এরপরই গানটি আমি সুর করলাম।

পুঁথিপাঠের বিষয়ে এ দেশে আপনি পথিকৃৎ। মৈমনসিংহ গীতিকা বা এর ছায়ায় আকৃষ্ট হয়ে কি এটা শুরু করেছিলেন?
না, পুঁথিপাঠ আমি অনেক ছেলেবেলা থেকেই করে থাকি। এর একটি আলাদা ঢং আমি তৈরি করেছিলাম। আমি ঢাকায় এসে খুব ভালো একটি

সঙ্গ পাই। ঢাকায় এসে আমার বসবাস শুরু হয় জিন্দাবাহার সেকেন্ড লেনের বাড়িতে। এই বাড়িতে ছিলেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, বেদার উদ্দিন, সোহরাব হোসেন, মমতাজ আলী খানসহ আরো অনেকে। আর আমি থাকতাম বিখ্যাত শিল্পী মমতাজ আলী খানের ঘরে। তাই এই মানুষটিকে আমার অনেক কাছে থেকে দেখা, কাছে থেকে শেখা। আর আব্দুল হালিম চৌধুরী ছিলেন তখনকার রেডিওর প্রযোজক। তার জন্যই আমার প্রথম রেডিওতে আসা।
আমি বলছিলাম পুঁথিপাঠের কথা...
হ্যাঁ, আমি সে কথায়ই আসছি। রেডিওতে আমি কাজ শুরু করেছিলাম বিভিন্ন টাইপের গান দিয়ে। কখনো নজরুলগীতি, কখনো আধুনিক, কখনো লোকগীতি। একপর্যায়ে আমার পুঁথিপাঠ নিয়ে একটা নিয়মিত প্রোগ্রাম দেয়া হলো। ঠিক করা হলো, আমি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ছেলেমেয়েদের গানের বিষয়ে তালিম দেবো। তো একবার খুব ঘূর্ণিঝড় হলো সারা বাংলাদেশে। ওই দিন নিয়মিতভাবেই আমি লাইভ পুঁথিপাঠ বা গানের আসরের জন্য গিয়েছি। হঠাৎ বড় সাহেবের রুম থেকে আমাকে ডাকা হলো। আমাকে বলা হলো, 'আজকে সারাদেশে এত ঝড়-বন্যা, এর মধ্যে গানের অনুষ্ঠান বন্ধ থাকুক।' আমি নাছোড়বান্দা। কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম এবং আগের দিনের প্রেক্ষাপট নিয়ে গান লিখে তা শেখাতে লাগলাম। পরদিন তো অনেক লোকের ভিড় স্টেশনে, পত্রিকায় প্রতিবাদ। তাদের সবার বক্তব্য, আব্দুল লতিফ কি জানত যে গতকাল ঝড় উঠবে। নইলে এটা কিভাবে সম্ভব?
২০০২-এর ফেব্রুয়ারি, স্থান ঃ শ্যামলীর আব্দুল লতিফের বাসা

বায়ান্ন বছরের সংসার
আব্দুল লতিফের জীবনের সংখ্যাতত্ত্ব যদি হিসাব করা যায়, তাহলে দেখা যাবে বরেণ্য এই মানুষটি বোধকরি ফেব্রুয়ারি আর বায়ান্নর প্রতীকী মানুষ হিসেবেই এসেছিলেন। তার জন্ম ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারিতে, চলে গেছেন ২০০৫-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি ভাষার মাসেই। ১৯৫২ সালে বিয়ে করেন পটুয়া কামরুল হাসানের বোন অর্থাৎ এখনকার নাজমা লতিফ... আর সংসারজীবনটাও ছিল ৫২ বছরেরই।

এটিএন বাংলার বিশেষ এই ডকুমেন্টারি করতে গিয়ে কথা হয়। ঘরে ক্যামেরা ইউনিট নিয়ে দেখি... তখনো বিছিয়ে রেখেছেন সেই চাদরটিই, যে চাদরে তিনি শেষ্বারের মতো ঘুমিয়েছিলেন। কেমন ছিল আপনার সংসারজীবন। আপনাদের বিয়ের গল্পটা একটু বলুন... শুনি।

নাজমা লতিফের কথায় তখন স্মৃতি খোঁজার এক বিষণ্নতা। 'আমি তো এক শিশুস্বামীকে নিয়ে ঘর করলাম। ওর সব কিছুতেই একটা বাচ্চাসুলভ ব্যাপার ছিল। এই তো কিছু দিন আগেও আমাকে কথায় কথায় বলে উঠলেন, 'নাজমা, জহির রায়হানকে বাসায় ডাক দাও তো। নিজের প্রিয় মানুষদের কথা শুধু বারবার আওড়াতেন তিনি। আমার তো শেষ দিকে ধমকিয়ে ঠিক রাখতে হতো। শেষ দিকে খুব কথা বলছিলেন। অনর্গল কথা। আমি ধূমপান না করার জন্য বারবার ধমকাচ্ছিলাম। আর বেশি ঘর থেকে বাইরে বেরুতে দিতাম না বলে খুব রাগ করত। এর পরও কে শোনে কার কথা। এর কয়েক দিন আগে আমি নিজে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, নিচে এক মুচিকে নাকি প্রতিদিন গান শেখাতেন। আমি বললাম, 'তুমি ওকে গান শিখিয়ে কী করবে। ও শুধু হাসত। তবে সব ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শ করত।

আমাদের বিয়েটা হয়েছে একেবারে দু'জন দু'জনকে না দেখে। আমি চট্টগ্রামে আমার বাড়িতে। সব ঠিকঠাক করল পরিবার। হঠাৎ লতিফকে খবর দেয়া হলো এখনই তাকে চট্টগ্রাম যেতে হবে। আমাদের পরিবারের সাথে আগে থেকেই একটু-আধটু জানাশোনা ছিল। '

তবে সংসারজীবনের স্মৃতি আর কী বলব। খুব আড্ডাবাজ ছিল সে। তুমিও তো এই বাড়িতে তার কাছে এসে সারাদিন পর যেতে। কথায় সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। আর আমাকে জ্বালাত। সারাদিন পর দেখা গেল রাতে একদল বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে বাসায় এলো। এসেই বলত রান্না চড়িয়ে দাও। কোনো প্রস্তুতি নেই। এভাবে করতে করতে অবশ্য আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এরপর আমি প্রতিদিনই দু-চারজনের বাড়তি খাবার রেডি করে রাখতাম।

বন্ধুদের কথা

ড. আসাদুল হক। খুব কাছে থেকে দেখেছেন তিনি আব্দুল লতিফকে। স্মৃতিচারণের কথা শুনতে চাইলে বললেন এক মজার গল্প। 'আমরা অর্থাৎ পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন, আব্দুল লতিফসহ আরো কয়েকজন। প্রতি জোছনা রাতে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভাড়া করে গান গাইতাম আর জোছনা দেখতাম। গানের মূল শিল্পী ছিলেন তখন লতিফ ভাই। একবার লতিফ ভাই এক আধ্যাত্মিক গান ধরলেন। গানটির কথা আমার ঠিক মনে নেই। গানটি গাইবার পরই জসীমউদ্‌দীন ভাই আর লতিফ ভাই সে কী যে কান্নার রোল ধরলেন, সেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এ রকম কোনো ভালো সুর বাঁধলেই একে অপরে জিকির তুলতেন। কবি জসীমউদ্‌দীন ছিলেন যেমন বিশাল দেহের অধিকারী, তেমনি লতিফ ভাই ছিলেন ঠিক তার উল্টো।

গণআন্দোলনের পথিকৃৎ মানুষ কামাল লোহানীর কথাও ধারণ করতে যাই লতিফ ভাইয়ের স্মরণে এই অনুষ্ঠানের জন্য। কামাল লোহানী বললেন, 'অসম্ভব মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন এক মানুষ। আমরা দলবেঁধে লতিফ ভাইয়ের গান শুনতে যাইতাম। আমরা তখন ভাষা আন্দোলনোত্তর প্রতিটা সংগ্রামে যেমন ভাষণ বা মিছিল-সেমিনারে অংশ নিতাম, এর প্রায় সমান কাজ দিত লতিফ ভাইয়ের এক একটি গান।

একটি আক্ষেপের গল্প

আমরা এটিএন বাংলার বিশেষ অনুষ্ঠান 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চাই' অনুষ্ঠানের জন্য যখন তার রেকর্ড সংগ্রহ করতে খোঁজখবর নিচ্ছি, ঠিক তখন দেখা গেল কারো কাছেই কোনো সংগ্রহের উদ্যোগ নেই। এবং কোনো আর্কাইভও নেই। একমাত্র তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু রফিকুল হক ঝন্টুর উদ্যোগে একটি মাত্র অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। এই আক্ষেপের কথা জানাতে গিয়েই তিনি বললেন, 'লতিফ ভাইকে নিয়ে আমরা বলতে গেলে অনেক কিছুই বলে ফেলি কিন্তু করার সময় কারোরই উদ্যোগ দেখা যায় না। '

আব্দুল লতিফের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ঝন্টু বলেন, 'আমি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করি। তো সেই সময় একটি ছবিতে হঠাৎ আনোয়ার হোসেনের লিপে লতিফ ভাইয়ের একটি গান ডিমান্ড করে। আমি তার বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। বললাম লতিফ ভাই আমাকে একটা গান দিতে হবে, সিকোয়েন্স হলো এই রকম। লতিফ ভাই সরাসরি না করলেন। এখন গান লিখতে পারব না। আমি তো নাছোড়বান্দা। পরে সারাদিন আড্ডা দিয়ে রাতে মাত্র ১০ মিনিটে গান বেঁধে দিলেন।

শ্যামলীর এই বাড়িটাই আব্দুল লতিফের এখন একমাত্র সংগ্রহশালা। গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর নিজ উদ্যোগে তার কিছু স্মৃতি সংরক্ষণ করেছেন। এ ছাড়া তার স্বকণ্ঠের রেকর্ড ধুলার আস্তরণেও নষ্ট হচ্ছে। কারণ তার এই গানগুলো নতুন করে সংগ্রহের কোনো তাগিদ নেই। তার ছেলে আরিফ জানালেন, 'আমরা অনেকবার বিভিন্ন মাধ্যমে বলেছি যে আমাদের বাবা তো আর আমাদের একার সম্পদ নন। তার এসব সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারসহ সমস্ত শিল্পী গোষ্ঠীর।'

আব্দুল লতিফ তার জীবদ্দশায় অনেকবার কথায় কথায় এসব কথা বলে গেছেন, ‘আমার এই গানগুলো নিয়ে কেউ ভাবে না। শুধু সেমিনার আর বক্তব্যে আমাকে ডাকে!!’ এই আক্ষেপ বোধ করি এখনো তার ভেতরেই কাজ করে সাধারণ সাদাসিধে যাপিত জীবনের এই মানুষটি। এ দায় আমাদের। এ আমাদের সঙ্কীর্ণতা।

পুরস্কার
তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তমঘায়ে ইমতিয়াজ পদক লাভ যা তিনি ১৯৭১ ালের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে প্রত্যাখ্যান করেন
১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদক লাভ। ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৪ সালে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার লাভ করেন সাস্কৃতিক ক্ষেত্রে আজীবন অবদানের জন্য
প্রকাশনা
আবদুল লতিফের মাট ৩টি প্রকাশনা রয়েছে
দুয়ারে আইসাছে পালকী; প্রকাশক বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ। ভাষার গান, দেশের গান, প্রকাশক বাংলা একাডেমী। ইসলামি গানের বই দিলরবা, প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
নিজের প্রিয় ও বিখ্যাত গান
ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়। সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা। আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে। দুয়ারে আইসাছে পালকী নাইওরি নাও তোল। দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা। সর্বনাশা পদ্মা নদী তোর কাছে শুধাই।